ওপার বাংলার পুজো

ক্রান্তির গর্ব

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১০ সেপ্টেম্বর : ওপার বাংলার পুজো এখন ক্রান্তির গর্ব। ক্রান্তির গোলাবাড়ির সাহাবাড়ির এই পুজো চলতিবছর একশো একান্ন বছরে পড়ল। ওপার বাংলার ঐতিহ্য বহনকারী সাহাবাড়ির এই পুজোতেই মেতে ওঠেন ক্রান্তিবাসী। প্রাচীন এই পুজো বাস্তবেই যেন এক মিলনমেলা হয়ে ওঠে।

আনুমানিক দেড়শোবছর আগের কথা। বাংলাদেশের ফরিদপুরের টেপাখোলা গ্রামের ব্যবসায়ী রূপলাল সাহা তাঁর বাড়িতে দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। বছর কুড়ি সেখানে পুজো করার পর তিনি চলে আসেন এপার বাংলায়। এখানে এসে ক্রান্তির চিকনমাটিতে চেল নদীর পাড়ে বসবাস শুরু করেন। ব্যবসা ও পরিবারের সঙ্গে মায়ের কাঠামোও এদেশে নিয়ে আসেন রূপলালবাবু। সেই থেকেই ওপারের পুজো চলে আসে এপারে। তবে চেল নদীর ভাঙন শান্তিতে থাকতে দেয়নি রূপলালবাবুকে। ভাঙন থেকে বাঁচতে নিজের বাড়িঘর সরিয়ে আনেন ক্রান্তির গোলাবাড়িতে। তবে, ততদিনে তাঁর চার ছেলে বরদাকান্ত সাহা, কেশবচন্দ্র সাহা, রজনীকান্ত সাহা, রমণীকান্ত সাহা অনেকটাই উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরাই একত্রিত হয়ে চিকনমাটি থেকে গোলাবাড়িতে জাঁকজমক সহকারে পুজো শুরু করেন। বহু বছর সুষ্ঠুভাবে পুজো হওয়ার পর তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম বজেন্দ্রনাথ সাহা, নরেন্দ্রনাথ সাহা, হিতেন্দ্রনাথ সাহা, বীরেন্দ্রনাথ সাহা সহ খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা মিলে ১৫ জন পুজোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। তবে, এখানেও বাধ সাধে ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যা। সেই বছর দুর্গাপুজোর কয়েকদিন পরে হওয়া ভয়াবহ বন্যায় ভেসে যায় মায়ের কাঠামোটিও। বাড়িঘর সহায়সম্পত্তি সমস্তকিছু কেড়ে নেয় বন্যা। বন্যার পর একান্নবর্তী এই পরিবারটি আলাদা হয়ে ক্রান্তির বিভিন্ন এলাকায় বসবাস শুরু করে। ক্রান্তিতে বাস শুরু করেন নরেন্দ্রনাথ সাহার ছেলে মনোজ সাহা। তার পাশেই বাড়ি বজেন্দ্রনাথ সাহার ছেলে বাপন সাহার। বজেন্দ্রনাথ সাহা, নরেন্দ্রনাথ সাহা, হিতেন্দ্রনাথ সাহারা বেঁচে না থাকলেও তাঁদের দুই ভাই ফণীন্দ্রনাথ সাহা, দিলীপকুমার সাহারা বেঁচে আছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাই রাজেন্দ্রনাথ সাহা, অজিতকুমার সাহা ও নরেন্দ্রনাথ সাহা। তাঁরা জলপাইগুড়িতে থাকেন। বর্তমানে গোলাবাড়ির পৈতৃক বাড়িতেই মায়ের মন্দির রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকলেও পুজোর ক'টাদিন মিলিত হন ক্রান্তির গোলাবাড়িতে। বাপন সাহা জানান, তাঁদের পনেরো ভাইয়ের মধ্যে ছয় ভাই ক্রান্তিতে থাকেন। বাকি নয়জনের মধ্যে ছয়জন জলপাইগুড়ি ও তিনজন শিলিগুড়িতে থাকেন। তবে, যে যেখানেই থাকুন না কেন পুজোর শুরু থেকেই সকলে চলে আসেন ক্রান্তির গোলাবাড়ির বাড়িতে। পঞ্চমী থেকেই বাড়ির মহিলাদের রান্না সহ সমস্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানও। তাছাড়া অষ্টমী ও নবমীতে দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থাও রয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। বংশপরম্পরায় এখানে পুজো করার দায়িত্ব পালন করে আসছেন সুভাষ চক্রবর্তী। এবারও তাঁর হাতেই পুজো হবে। পরিবারের সদস্যরা জানান, রীতি মেনে চালকুমড়ো বলির প্রথা আজও প্রচলিত আছে। তাছাড়া দশমীতে ঘট বিসর্জনের পর দই, চিঁড়ে খাওয়াবার রেওয়াজ ও মায়ের বিসর্জনের পর গোটা ক্রান্তির বাসিন্দাদের মধ্যে নকুলদানা, বাতাসা ও মুড়িমুড়কি বিলি করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় পুজো বলতে ছিল এই একটাই। তাই পুজো দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় জমাতেন এখানে। পুজোর পাঁচদিন নিয়মরীতি মেনে জাঁকজমকভাবে পুজো হত। পুজোর পরম্পরা, রীতি আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। সেইসব পুরোনো নিয়মরীতি মেনে মা দুর্গা আজও পূজিত হন সাহা পরিবারে। এবছরেও তিস্তাপাড়ের সাহাবাড়িতে মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

সম্প্রীতির আবহে গা ভাসায় দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ সেপ্টেম্বর : সারাদিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যায় ক্লাবে চলে একসঙ্গে আড্ডা। তাঁরা কেউ পেশায় স্কুল শিক্ষক, কেউ আবার সরকারি কর্মচারী বা অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। কেউ হিন্দু, আবার কেউ মুসলমান। কিন্তু পুজোর আগে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কোচবিহারের শিলিগুড়ি রোড সংলগ্ন দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাবের দুর্গাপুজো যেন সম্প্রীতির মেলবন্ধন। ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান, সম্প্রীতির মেলবন্ধনই তাঁদের ক্লাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে চলে পুজোর পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা। তারপর ক্লাবের সদস্যরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে এলাকায় পুজোর চাঁদা তুলতে যান। এভাবে প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ওই ক্লাবের পুজোর উদ্যোক্তারা চাঁদা সংগ্রহে বের হন। পুজোর আগে ক্লাবের তরফে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দুস্থদের মধ্যে নতুন বস্ত্রও বিতরণ করা হয়।

আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই শুরু হচ্ছে দুর্গাপুজো। তাই রোজ সন্ধের আলোচনায় শামিল হচ্ছেন পুজো কমিটির সভাপতি সমীরকুমার মজুমদার, ক্লাবের সম্পাদক প্রবীর পণ্ডিত, পুজো কমিটির সদস্য আলোনা ইয়াসমিন, ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিকুল আহমেদ প্রমুখ।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় যখন সাম্প্রদায়িক হিংসার খবর শিরোনামে উঠে আসছে, সেই সময় কোচবিহারের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব সম্প্রীতির নজির অনেকদিন ধরে বজায় রেখেছে। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর ষষ্ঠীর দিন পুজোর উদ্বোধন হবে। তারপর প্রসাদ বিতরণ, বস্ত্রদান ও নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি রয়েছে। তাই পুজোর আয়োজনকে সফল করার দায়িত্ব সবাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি সমীরকুমার মজুমদার বলেন, 'আমাদের নাম-পদবি শুধু আলাদা। মনে-প্রাণে আমরা সবাই এক। একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ে আমরা বড়ো হয়েছি। আমরা সকলে মিলে পুজোর দায়িত্ব ভাগ করে নিই।' পুজো কমিটির সদস্যা আলোনা ইয়াসমিন বলেন, 'আমরা সবাই আসলে এক পরিবারের অংশ। বিপদে-আপদে আমরা একসঙ্গেই থাকি। দুর্গাপুজো, কালীপুজো সহ সব উৎসবেই আমরা একসঙ্গে কাজ করি।'

পুজো এগিয়ে আসায় ক্লাবঘরও সেজে উঠেছে। এবছরও ডাকের সাজের প্রতিমা তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। ক্লাবের সম্পাদক প্রবীর পণ্ডিত বলেন, 'পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যেকোনো পুজোর আয়োজন আমরা একসঙ্গেই করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে পুজো হয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বেলুড় মঠের প্রথা মেনে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে গত আঠারো বছর ধরে দুর্গা আরাধনা করে আসছে শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি। পঞ্চমী থেকে শুরু করে পাঁচদিনব্যাপী মায়ের আরাধনার দিনগুলিতে আশ্রম চত্বর দর্শনার্থীদের ভিড়ে গমগম করে ওঠে। তবে আশ্রমের পুজোয় কুমারীপুজো যে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭৯ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ সরণিতে এই আশ্রমের যাত্রা শুরু। আশ্রম সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৭৮ সালে স্বামী গহনানন্দ উত্তর-পূর্ব ভারতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি একদিন শিলিগুড়িতে আসেন। শহরের ভক্তরা স্বামী গহনানন্দের কাছে আশ্রম তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি ভক্তসমাগমের আয়োজন করতে বলেন। গহনানন্দের কথা মতো ১৯৭৯ সালের ১ মে স্থানীয় এক বাড়িতে ভক্তসমাগমের আয়োজন করা হয়। শহরের প্রায় দুশো বাসিন্দা তাতে অংশ নেন। সেই বছরই এক ভক্তের দান করা দুই বিঘা জমিতে এই আশ্রম তৈরি হয়। বেলুড় মঠের প্রথা অনুযায়ী ১৯৭৯ সাল থেকে দেবীর আরাধনা শুরু হয়। আশ্রমের পরিচালন সমিতির সম্পাদক কমল মজুমদার বলেন, 'প্রতিবছর মালদার গাঙ্গুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে দশ-বারো জন পূজারির একটি দল এসে মায়ের পুজো করে থাকে। পঞ্চমী থেকে দেবীর আরাধনা শুরু হয়। অষ্টমীতে কুমারীপুজোর আয়োজন করা হয়। দশমীতে সূর্য ডোবার আগেই ধুমধাম করে বিসর্জন হয়।' তিনি আরও বলেন, 'সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর মধ্যাহ্নে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। পুজোর দিনগুলিতে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।'

পুজোর বোনাস

আজকের প্রশ্ন

ক্ষত্রিয় হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জমদগ্নি ঋষির পুত্র পরশুরাম কেরলে ১০৮টি দুর্গামন্দির তৈরি করেছিলেন বলে কথিত আছে। এই মন্দিরগুলির অন্যতমটি আলাপ্পুঝা জেলায় পৌরাণিক পম্পা নদীর তীরে অবস্থিত। মন্দিরটির নাম কি?

উত্তর পাঠান আমাদের
হোয়াটসঅ্যাপ 9064849009 নম্বরে।
প্রথম সঠিক উত্তরদাতার জন্য থাকবে বিশেষ পুরস্কার।
* একাধিক উত্তর পাঠালে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

গতকালের উত্তর ঃ চামুন্ডা
প্রথম সঠিক উত্তরদাতা ঃ সমব্রত ঘোষ, জলপাইগুড়ি

দুধ ইলিশ

রিমা সেনগুপ্ত
শান্তিপাড়া, ভক্তিনগর

উপকরণ

ইলিশ মাছ, গোটা জিরে, দুধ, ভাজা জিরে, সরষের তেল, নুন, হলুদ।

কীভাবে রাঁধবেন

প্রথমে মাছগুলো ধুয়ে নিতে হবে। তারপর মাছগুলোতে নুন, হলুদ, ভাজা জিরে দিয়ে মাখিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর কড়াইয়ে তেল গরম হলে তাতে গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে নুন, হলুদ ও ভাজা জিরে দিয়ে মাখানো মাছগুলো ছেড়ে দিতে হবে। মাছগুলো ভাজা হলে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর দুধটা মাছের মধ্যে কিছুটা ঢুকে গেলে ভাজা জিরে ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলেই রেডি দুধ ইলিশ।

ক্যাপ ফাটানোর ফটাস ফট-এই আমার পুজো

শিবশংকর পাল

খেলনা বন্দুকের সেই ক্যাপ ফাটানোর ফটাশ ফট আওয়াজ আজও দিব্যি কানে বাজে। আজকালকার বাচ্চারা তো আর সেভাবে পুজোর সময় এই বন্দুক নিয়ে খেলে না। আমরা কিন্তু দিব্যি খেলতাম। বলতে গেলে এই বন্দুক নিয়েই পুজোর ক'টা দিন বুঁদ হয়ে থাকতাম। আর কিছু না হোক, এই বন্দুক না হলে পুজোটাই মাটি ছিল। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের আদি কালীবাড়ি যুব সংঘের পুজো ছিল আমার পাড়ার পুজো। ছোটোবেলা থেকেই সরাসরি এই পুজোয় যুক্ত। নিজেরাই মণ্ডপ গড়ার কাজ থেকে শুরু করে ঢাক বাজানোর কাজ সবই করতাম। বড়োরা পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত থাকলে তাঁদের যাবতীয় সহযোগিতা করতাম। পরে যখন কিছুটা বড়ো হলাম তখন পুজো পরিচালনার দায়িত্বের অনেকটাই আমাদের কাঁধে এল। চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে প্রতিমা ভাসান, কত্ত কাজ! একবার তো যাকে মণ্ডপ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সময়মতো কাজ শেষ করতে না পেরে তিনি পালিয়েই গেলেন। আমাদের তো মাথায় হাত! তবে দমে অবশ্য যাইনি। শেষপর্যন্ত নিজেরাই কোনোমতে সেই মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম। পাড়ার পুজোর আয়োজন, দল বেঁধে চাঁদা তোলা, ভোগ খাওয়া, দশমীতে খালি গায়ে নাচতে নাচতে ভাসানে যাওয়ার সেই সমস্ত স্মৃতি আজও দিব্যি মনে পড়ে। ব্যস্ততার জেরে পুজোর আগে এই সময়টা অনেক সময় তুফানগঞ্জের বাইরে থাকতে হয়। মনটা কিন্তু আমার নিজের পাড়াতেই পড়ে থাকে। পাড়ার বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে পুজোর আয়োজন, ভোগ খাওয়া, পুজো দেখতে বের হওয়া- এসব খুবই মিস করি। এখন আর আগের মতো বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে এপাড়া থেকে ওপাড়া ঘুরে বেড়ানো হয় না। নিজের হাতে পাড়ার পুজোয় ভোগ বিতরণ করাও হয় না। তবে, পুজোর এক মাস আগে থেকে এই যে পুজো আসছে আসছে ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করি। যতটা সম্ভব পরিবারকে বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। কলকাতা বা দেশ-বিদেশের যেখানেই থাকি না কেন এইসময় বাবা, মা, দাদা, বউদি, স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে পুজো দেখতে বের হই। পুজো তো এখন সমস্ত জায়গাতেই হয়, তাই প্রতিমা দর্শনে সমস্যা হয় না। মেয়ে যখন সেজেগুজে পুজোয় আনন্দ করে তখন আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায়। কিছুটা নস্টালজিয়ায় ভুগি। বিভিন্ন পুজোর উদ্বোধনের আমন্ত্রণও থাকে। এই যেমন আমার গতবারের পুজো কেটেছিল মিজোরামে। এবছরের পুজোয় কিন্তু তুফানগঞ্জেই থাকার ইচ্ছে রয়েছে। সপ্তমীতে পাড়ার পুজোয় দরিদ্রনারায়ণ সেবার ভাবনাচিন্তা রয়েছে।

পুজোর ঢাকের বাজনা শুনতে পারব ভেবেই মনটা এখন থেকে বেশ ফুরফুরে হয়ে রয়েছে। তবে, ব্যস্ত শিডিউলের জেরে শেষপর্যন্ত সমস্ত প্ল্যানিং না চৌপাট হয়ে যায়! যেহেতু খেলাধুলোর জগতে যুক্ত রয়েছি তাই খুদেদের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়। এই সময়টা ওদের কাছ থেকে পুজোর গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে। ওদের পুজোর প্ল্যানিং শুনে অবাক লাগে। ওরা কতটা গুছিয়ে চিন্তাভাবনা করে, বেড়াতে গিয়ে অনেককিছু জানার চেষ্টা করে। আমাদের সময় তো এত্ত কিছু ছিল না। সেই ক্যাপ ফাটানোর ফটাস ফট শব্দেই দিব্যি আমাদের পুজো কেটে যেত। সবার পুজো ভালোভাবে কাটুক।